# মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০২৬

## বিশ্ব শরণার্থী দিবস ২০২৬ উদযাপন ও 'লস্ট ল্যান্ড' চলচ্চিত্র প্রদর্শন

সারা বিশ্বের শরণার্থী সংকট, জোরপূর্বক স্থানচ্যুতি এবং মানবিক সংহতির গুরুত্ব তুলে ধরে প্রতিবছর ২০ জুন পালিত হয় বিশ্ব শরণার্থী দিবস। এই উপলক্ষে ২৪ জুন ২০২৬ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে বিশেষ আলোচনা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনির আয়োজন করা হয়।

স্বাগত বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন, গত শতাব্দীতে এ দেশের মানুষ অন্তত দু'বার ভয়াবহ শরণার্থী সংকটের সম্মুখিন হয়েছে। প্রথমবার ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় এবং দ্বিতীয়বার ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে, যখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীদের পরিচালিত গণহত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের মুখে প্রায় এক কোটি মানুষ প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ১৯৭১ সালের গণহত্যা ও শরণার্থী সংকটকে ভুলে যাওয়ার যেকোনো চেষ্টা দেশটিকে একধরণের সামষ্টিক স্মৃতিভ্রংশের দিকে নিয়ে যাবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতি বছর বিশ্ব শরণার্থী দিবস পালন করে এই ঘটনাগুলোকে স্মরণ করার লক্ষ্যে।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা UNHCR-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ এইচ. ই. মি. আইভো ফ্রেইজসেন তার বক্তব্যে বিশ্ব শরণার্থী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং শরণার্থীদের কেবল সংকট বা পরিসংখ্যানের আলোকে নয়, বরং স্বপ্ন, সম্ভাবনা ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে দেখার আহ্বান জানান। তিনি কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সঙ্গে বিশ্ব শরণার্থী দিবস উদযাপনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং ১৯৭১ সালে ভারতে আশ্রয় নেওয়া এক কোটিরও বেশি বাংলাদেশি শরণার্থীর সংগ্রাম ও প্রত্যাবর্তনের ইতিহাস স্মরণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ শরণার্থী বেশ অনেক দিন ধরেই স্থানচ্যুত অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশে আশ্রিত প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গার নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের জন্য মিয়ানমারে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক মহলের সহায়তা অপরিহার্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ঢাকার অ্যালিয়ঁস ফ্রঁসেজের পরিচালক মঁসিয়ে ফ্রাঁসোয়া শামব্রো তার বক্তব্যে Lost Land চলচ্চিত্রটির তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, Lost Land চলচ্চিত্রটি কোনো বিনোদনমূলক চলচ্চিত্র নয়

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

## জল্লাদখানা বধ্যভূমির উনবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

*২১ জুন ২০২৬*

প্রবল বৃষ্টিপাতে মিরপুর ভেসে গেলেও সকলের আন্তরিত অংশগ্রহণে সফল পরিসমাপ্তি ঘটে 'জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠের উনবিংশতিতম বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান। ২১ জুন ২০২৬ আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন স্থপতি ও নগর পরিকল্পাবিদ সালমা এ শফি। তিনি বলেন, এই এলাকা পরিচ্ছন্ন এবং অবকাঠামো নান্দনিকভাবে গড়ে তুলতে বহুবছর ধরে চেষ্টা করছেন তিনি। জল্লাদখানা বধ্যভূমির অনুষ্ঠান পরিচালনা সহজ ও সুন্দরভাবে আয়োজনের জন্য সিটি করপোরেশনের সাথে একটি স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণে তিনি সহযোগিতা করেন। একাত্তরে শত শত বাঙালিকে জল্লাদখানায় হত্যার ইতিহাস স্মরণ এবং নতুন প্রজন্মের কাছে বহমান রাখতে বধ্যভূমির স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি এবং এর বিকল্প নেই বলে উল্লেখ করেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও

৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

## মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)-এর শিক্ষার্থীদল

গত ১১ জুন ২০২৬ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)-এর পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ বিভাগের একদল শিক্ষার্থী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

আয়োজন শুরু হয় বাংলাদেশের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে। এরপর শিক্ষার্থীরা জাদুঘরের চারটি গ্যালারি পরিদর্শন করেন। ব্যক্তিগত স্মারক, দলিল, সংবাদপত্রের

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

# আন্তর্জাতিক আর্কাইভস সপ্তাহ ২০২৬

## আন্তর্জাতিক কাউন্সিল অন আর্কাইভস (ICA) আয়োজিত ওয়েবিনারে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্মীর উপস্থাপনা

আন্তর্জাতিক কাউন্সিল অন আর্কাইভস (ICA) আয়োজিত আন্তর্জাতিক আর্কাইভস সপ্তাহ ২০২৬-এর কেস স্টাডি ওয়েবিনার সিরিজে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভ কর্মকর্তা এবং যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব উইনচেস্টারে অধ্যয়নরত সোফিয়া নাজনীন অংশগ্রহণ করে। ৮-১২ জুন ২০২৬ অনুষ্ঠিত এই আয়োজনের প্রতিপাদ্য ছিল "#ArchivesForJustice: Rights, Memory & Futures"। এবারের প্রতিপাদ্যে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, স্মৃতি সংরক্ষণ, অধিকার রক্ষা এবং সমতাভিত্তিক ভবিষ্যৎ নির্মাণে আর্কাইভের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পাঁচ দিনে পাঁচটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়, যা ছিলো : জবাবদিহিতার জন্য আর্কাইভ; স্মৃতির জন্য আর্কাইভ; অন্তর্ভুক্তির জন্য আর্কাইভ; আর্কাইভ, ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার ও অ-সার্বভৌম প্রেক্ষাপট; এবং ভবিষ্যৎ ন্যায়বিচারের জন্য আর্কাইভ।

১১ জুন ২০২৬, ওয়েবিনারের চতুর্থ দিনে সোফিয়া নাজনীন "Preserving Voices of Survival: Oral Histories, Gendered Memory, and Human Dignity in the Liberation War Museum Archive" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনাটি "Archives for Memory: Recognition, Human Dignity, and Lived Experience" বা স্মৃতির জন্য আর্কাইভ শিরোনামের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে আলোচিত হয় কীভাবে আর্কাইভ বিভিন্ন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের মাধ্যমে এর স্বীকৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে এবং মানবিক মর্যাদা রক্ষায় অবদান রাখে।

কেস স্টাডিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহ প্রকল্প তুলে ধরা হয়, যা ২০০১ সালে জাদুঘরের আউটরিচ ও কমিউনিটি এনগেজমেন্ট কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুরু হয়। উপস্থাপনায় আলোচনা করা হয়, কীভাবে জাদুঘর ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রায় ৫৬ হাজার প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছে, যাদের অভিজ্ঞতাকে এর আগে কোথাও তুলে ধরা হয়নি বা আনুষ্ঠানিকভাবে নথিভুক্ত করা হয়নি। উপস্থাপনায় বিশেষভাবে মুক্তিযুদ্ধকালীন নারীর প্রতি সহিংসতা, নারীর যুদ্ধকালীন স্মৃতি, উদ্বাস্তু জীবনের স্মৃতি, জনগণের প্রতিরোধশক্তি এবং টিকে থাকার অভিজ্ঞতা সংরক্ষণে মৌখিক ইতিহাসের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

এছাড়াও উপস্থাপনায় বীরাঙ্গনাদের সাক্ষ্য সংরক্ষণে জাদুঘরের উদ্যোগ তুলে ধরা হয়। ট্রমা সংশ্লিষ্ট স্মৃতি নথিভুক্ত ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নৈতিক বিবেচনা যেমন সাক্ষ্যদাতার পূর্বসম্মতি গ্রহণ, তাদের গোপনীয়তা রক্ষা বিষয়ক আর্কাইভ চর্চা নিয়েও আলোচনা করা হয়। একই সঙ্গে যুদ্ধশিশু এবং দত্তক গ্রহণ-সংক্রান্ত ইতিহাসের নথি সংরক্ষণে জাদুঘরের চলমান ভূমিকা উপস্থাপনায় গুরুত্ব পায়। এই সংগ্রহসমূহ এখনও নিজেদের পরিচয় এবং পারিবারিক সংযোগ খুঁজে পেতে আগ্রহী ব্যক্তি ও পরিবারকে সহায়তা করছে, যা আর্কাইভ সংগ্রহের দীর্ঘ মেয়াদি সামাজিক গুরুত্বকে তুলে ধরে।

ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের আর্কাইভবিদ, রেকর্ড ব্যবস্থাপক, গবেষক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ক পেশাজীবীদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাজ বিনিময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ সৃষ্টি করে এবং আর্কাইভ, স্মৃতি সংরক্ষণ, মানবিক মর্যাদা রক্ষা, ট্রমা-সচেতন আর্কাইভ চর্চা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠ সংরক্ষণ বিষয়ে বৈশ্বিক আলোচনায় অবদান রাখে। আন্তর্জাতিক আর্কাইভস সপ্তাহ ২০২৬-এ অংশগ্রহণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভ কার্যক্রমের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা আরও সুদৃঢ় করেছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা সংরক্ষণে মৌখিক ইতিহাসের গুরুত্ব তুলে ধরেছে।

সেশনটি এখন ICA-এর ইউটিউব চ্যানেলে দেখা যাচ্ছে:
#IAW2026 Case Studies – Archives for Memory: Recognition, Human Dignity, and Lived Experience

# বিশ্ব শরণার্থী দিবস ২০২৬ উদযাপন

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

বরং এটি বাস্তুচ্যুতি, নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদার মতো জটিল বিষয়কে শিল্পসম্মতভাবে তুলে ধরেছে। জাপানি নির্মাতা আকিও ফুজিমোতোর পরিচালনায় নির্মিত এবং জাপান, ফ্রান্স, জার্মানি ও মালয়েশিয়ার যৌথ প্রযোজনায় তৈরি এই চলচ্চিত্রটি রোহিঙ্গা ভাষায় নির্মিত প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক সংকটের প্রেক্ষাপটে শরণার্থী সমস্যার প্রশ্নটি আজ আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আলোচনাপর্ব শেষে Lost Land চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে মালয়েশিয়া, এই দুই প্রান্তের মধ্যে বিস্তৃত এক অনিশ্চিত, বিপদসংকুল পথই 'লস্ট ল্যান্ড'-এর মূল কাহিনী। বছরের পর বছর ধরে নিপীড়িত মুসলিম সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দুই ভাই-বোনের এই যাত্রাই চলচ্চিত্রের কেন্দ্রবিন্দু।

নয় বছরের সমিরা এবং তার চার বছরের ছোট ভাই শফি, যাত্রার শুরুতে তাদের সঙ্গী দাদা ও এক ফুফু। রাতের আঁধারে, নিঃশব্দে অন্য রোহিঙ্গাদের সাথে একটি নৌকায় চড়ে তারা মিয়ানমার ছেড়ে যায়। কেন এই যাওয়া, সে প্রশ্নের উত্তর চলচ্চিত্র দেয় না। শুধু দুটি শিশু, একজন বড়, একজন ছোট; একজন মেয়ে, একজন ছেলে। বিস্মিত দুটি চোখ, যারা শীতে কাঁপে, ভয়ে কুঁকড়ে থাকে। তবু সমিরা বড় বোনের দায়িত্ব নিয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তে এগিয়ে আসে। যাত্রা দীর্ঘ। ক্লান্তিকর। পর্দায় ভেসে ওঠা অধ্যায় শিরোনামগুলো, কত দিন পেরিয়ে গেছে তার হিসাব, সেই ক্লান্তিকে আরও মূর্ত করে তোলে। নৌপথে এবং পরে থাই-ল্যান্ডের মাটি পেরিয়ে এই দুই ভাই-বোন মুখোমুখি হয় সেই মানবপাচারকারীদের, যারা নিরুপায় মানুষের বিপদকে পুঁজি করে অমানবিক উপায়ে মোটা অর্থ আদায় করে। মালয়শিয়াকে গন্তব্য হিসেবে বেছে নেওয়া অযৌক্তিক নয়, মুসলিম-অধ্যুষিত এই দেশে মামার কাছে পৌঁছানোর স্বপ্নটুকু অন্তত সম্ভাবনার মধ্যে থাকে। শরণার্থী সংকটের মানবিক দিক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ১৯৭১ সালের শরণার্থী অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমসাময়িক বৈশ্বিক বাস্তবতার সংযোগ অনুধাবনের মাধ্যমে মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে উপস্থিত দর্শকদের নতুনভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে আয়োজনটি।

**সাবরিনা আফরীন তন্বী**
গবেষণা সহকারী, গবেষণা ও গ্রন্থাগার বিভাগ
এবং
**এম. ফারহাতুল হক**
প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর, ফিল্ম সেন্টার

# হিমালয়ের পথে বাংলাদেশের পতাকা: ক্যাজো রি অভিযানের গল্প

স্বপ্ন আর সংশয়ের দোলাচল পেরিয়ে গত ১২ মে শুরু হয়েছিল আমার নেপাল যাত্রা। লক্ষ্য ছিল ৬,১৮৬ মিটার উচ্চতার কিয়াজো রি (Kzajo Ri) শৃঙ্গ আরোহন। এই অভিযানের অন্যতম প্রেরণা ছিল বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকাকে হিমালয়ের উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

এই অভিযানে MTB Foundation আর্থিক পৃষ্ঠপোষক হবার পাশাপাশি আমাকে এক বছরের জন্য Climate Change Ambassador হিসেবে মনোনীত করেন।

ঢাকা বিমানবন্দরেই অভিযানের প্রথম স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়। বোর্ডিংয়ের অপেক্ষায় বসে থাকা অবস্থায় কোরিয়ান বাবা ও তার ছোট ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের পতাকা আঁকা টি-শার্ট পরেছিলাম আমি। ছোট্ট ছেলেটি কৌতূহলভরে পতাকাটির দিকে তাকিয়ে ছিল। পরে জানতে পারলাম, সে বিভিন্ন দেশের পতাকা সংগ্রহ করে। বাংলাদেশের পতাকা দেখে সে আমার সঙ্গে ছবি তুলতে চাইল। বিদায়ের সময় তাকে ছোট ছোট কয়েকটা উপহার দিলে তার আনন্দ দেখে মন ভরে যায়। তখন উপলব্ধি করি, একটি পতাকা কেবল একটি দেশের পরিচয় নয়; এটি ইতিহাস, আত্মত্যাগ এবং সংগ্রামের প্রতীক। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের লাল-সবুজ পতাকা বহন করতে পারা সবসময়ই গর্বের।

দুই দিন প্রস্তুতি শেষে শুরু হয় মূল যাত্রা। কাঠমান্ডু থেকে দীর্ঘ সড়কপথ পেরিয়ে পৌঁছাই সুরখে গ্রামে। সেখান থেকেই শুরু হয় হিমালয়ের পথে পদযাত্রা। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ, দুধকোশী নদীর গর্জন, রডোডেনড্রনের রঙিন বন আর ছোট ছোট গ্রাম– সব মিলিয়ে যেন প্রকৃতির এক জীবন্ত ক্যানভাস।

পথে অনেক মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়। পাহাড়ি গ্রামগুলোর মানুষ সীমিত সম্পদ নিয়ে জীবনযাপন করলেও তাদের আন্তরিকতা ও হাসিমুখ সবসময় মুগ্ধ করে। বিশেষ করে পাহাড়ি শিশুদের দেখলে বিস্মিত হতে হয়। প্রতিদিন দীর্ঘ চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে তারা স্কুলে যায়। শিক্ষা অর্জনের প্রতি তাদের আগ্রহ আমাদের জন্যও অনুপ্রেরণার।

এক পাহাড়ি নারীর সঙ্গে কথোপকথন মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। এভারেস্ট বেস ক্যাম্পের এত কাছে বসবাস করেও তিনি কখনো সেখানে যেতে পারেননি। সংসার, সন্তান এবং দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততাই তার পৃথিবীকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। তার কথায় উপলব্ধি করি, স্বাধীনতা এবং স্বপ্ন দেখার সুযোগ এখনও পৃথিবীর সব মানুষের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত নয়।

নামচে বাজারে পৌঁছে যেন বিশ্বের পর্বতারোহীদের এক মিলনমেলায় প্রবেশ করি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অভিযাত্রীদের পদচারণায় মুখর এই জনপদ। এখানেই পরিচয় হয় আমার শেরপা গাইড ফুরি শেরপার সঙ্গে। পুরো অভিযানে তার অভিজ্ঞতা, ধৈর্য এবং সহযোগিতা আমাকে বারবার মুগ্ধ করেছে।

নামচে থেকে খুন্দে অঞ্চলের পথে হাঁটার সময় স্থানীয় নারীদের একটি দলকে দেখি পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যস্ত। তারা পর্যটকদের ফেলে যাওয়া বর্জ্য সংগ্রহ করছিলেন। পাহাড়কে পরিচ্ছন্ন রাখার এই সচেতনতা দেখেও অনুপ্রাণিত হয়েছি। হিমালয় কেবল পর্বতারোহীদের নয়; এটি স্থানীয় মানুষের জীবন, সংস্কৃতি ও ভবিষ্যতের অংশ।

অভিযান যত এগোতে থাকে, ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। গাইড ফুরি শেরপার ভাষ্যমতে, কয়েক বছর আগেও যেসব স্থানে শক্ত বরফ ছিল, এখন সেখানে উন্মুক্ত পাথুরে ভূমি দেখা যায়। অনেক হ্রদের রূপ বদলে গেছে। হিমবাহের বরফ গলে নতুন জলধারা সৃষ্টি হচ্ছে। এসব দৃশ্য কেবল প্রকৃতির পরিবর্তনের গল্প বলে না; বরং আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সতর্কবার্তাও দেয়।

সামিট পুশের আগের রাতে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়। গভীর রাতে শুরু হয় তুষারপাত। শীর্ষে ওঠা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। কিন্তু পর্বতারোহণের অন্যতম শিক্ষা হলো প্রতিকূলতার মধ্যেও এগিয়ে যাওয়া। রাত দুইটার পর শুরু হয় সামিটের উদ্দেশ্যে যাত্রা।

তুষারঝড়, খাড়া বরফঢাল, দীর্ঘ জুমারিং এবং প্রচণ্ড ঠান্ডা–সব মিলিয়ে পথটি ছিল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। এক পর্যায়ে হাত এতটাই ঠান্ডায় অবশ হয়ে পড়ে যে জুমার ধরাও কঠিন হয়ে যায়। ফুরি শেরপার দ্রুত সহায়তায় পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয়। শারীরিক শক্তি প্রায় শেষ হয়ে এলেও মানসিক শক্তি তখনও অবশিষ্ট ছিল।

একসময় যখন জানতে পারলাম আর মাত্র দুইশ মিটার পথ বাকি, তখন যেন নতুন করে শক্তি ফিরে পেলাম। মনে পড়ছিল বাংলাদেশের প্রথম নারী এভারেস্টজয়ী নিশাত মজুমদারের সেই অসম্পূর্ণ কিয়াজো রি প্রচেষ্টার কথা। মনে হচ্ছিল, শুধু নিজের জন্য নয়, পূর্বসূরিদের স্বপ্নের ধারাবাহিকতাও বহন করছি আমি।

অবশেষে ২৪ মে'র উজ্জ্বল সকাল ৮টা ১০ মিনিটে দাঁড়াই কিয়াজো রি-এর চূড়ায়। চারদিকে হিমালয়ের অসীম সৌন্দর্য, নীল আকাশ আর সাদা বরফের সমারোহ। সেই মুহূর্তে ব্যাকপ্যাক থেকে বের করি বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা।

পতাকাটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। গত কয়েক দিনের কষ্ট, অনিশ্চয়তা, ক্লান্তি এবং সংগ্রাম যেন এক মুহূর্তেই অর্থবহ হয়ে ওঠে। মনে হচ্ছিল, আমি একা নই; আমার সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ আর কিছু মানুষের স্বপ্ন।

চূড়ায় দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করেছি, পর্বতারোহণ আসলে মানুষের নিজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার গল্প। তাই কিয়াজো রির চূড়ায় বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের মুহূর্তটি আমার কাছে কেবল ব্যক্তিগত সাফল্য নয়; এটি ছিল দেশের প্রতি ভালোবাসা, পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং স্বপ্নপূরণের এক প্রতীকী প্রকাশ।

**– ইয়াছমিন লিসা,** মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

## জল্লাদখানা বধ্যভূমির উনবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

সদস্যসচিব মফিদুল হক বলেন, পঁচাত্তরের পর ইতিহাস বিকৃতি এবং অনেক ক্ষেত্রে ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। সেখানে বড় দিক হচ্ছে আমরা ইতিহাসকে রক্ষা করবো। ইতিহাসের স্মারক সংরক্ষণ এবং মর্যাদা দেব যেন এখানে কী ঘটেছিল স্মারকগুলো তা বলতে পারে। মিরপুরে অনেকগুলো বধ্যভূমি রয়েছে। তার মধ্যে মুসলিম বাজার অন্যতম। মুসলিম বাজার বধ্যভূমির সম্প্রসারণকালে মাটির নিচে থেকে উঠে আসে শহিদদের অস্থি । পত্রপত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হলে তা বড়রকম অভিঘাত তৈরি করে। সেখানে অনুসন্ধানকালে অনেকে জানায় যে, এখানে, জল্লাদখানায়ও একটি বধ্যভূমি রয়েছে। জনগণের আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি আক্কু চৌধুরীর নেতৃত্বে এখানে খননকাজে যুক্ত হন মুক্তিযুদ্ধের গবেষক ও লেখক এম এ হাসান, সহায়তা করে তখনকার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড। জল্লাদখানা বধ্যভূমিতে প্রাপ্ত অস্থিখণ্ড, মানুষের ব্যবহৃত সামগ্রীর তালিকা করা হয়েছে এবং সেগুলো সংরক্ষণ জরুরি। এখানে ছোট স্থানটিতে একটি স্থাপনা করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং এর সাথে যুক্ত করা হচ্ছে সকল বধ্যভূমির তালিকা। এই তালিকা এখনও অসমাপ্ত।

অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করেন বধ্যভূমিতে শহিদ আব্দুল হাকিমের পৌত্র তানভীর হামিদ তাহা। তিনি বলেন, তার দাদা শহিদ আব্দুল হাকিমের জন্য তিনি গর্ববোধ করেন। তার দাদার মতো লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। তিনি এই বধ্যভূমিকে অন্তরে ধারণ করেন এবং আজীবন মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ লালন করে এগিয়ে যাবেন। তিনি তার পিতাকে দেখেও অনুপ্রাণিত হন কারণ তার পিতা মো. আবদুল হামিদও জল্লাদখানা বধ্যভূমির রক্ষণাবেক্ষণে সচেষ্ট আছেন সব সময়।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে 'ধনধান্য পুষ্পভরা' এবং 'সূর্যোদয়ে তুমি সূর্যাস্তেও তুমি' সঙ্গীত পরিবেশন করে ওয়াই ডব্লিউ সিএ ফ্রি স্কুলের শিক্ষার্থীরা। বধ্যভূমির সন্তান দল পরিবেশন করে রবীন্দ্রসঙ্গীত 'বরিষ ধরা মাঝে' এবং নজরুলগীতি 'জয় হোক জয় হোক'।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শহিদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় জনগণ, শিক্ষার্থী এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

**সত্যজিৎ রায় মজুমদার**
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

# ৭১-এর স্মৃতিভাষ্য : শিল্পগুরু মুস্তাফা মনোয়ার

পর্ব-১

আমি তখন টেলিভিশনের প্রোগ্রাম ম্যানেজার। ২৩শে মার্চ ১৯৭১ ছিল পাকিস্তান ডে। বাড়ি বাড়ি পাকিস্তানি ফ্লাগ ওড়েনি সেদিন। অফিসে গিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম– টেলিভিশন শেষ হলে তো রাত সাড়ে ১০টায় ফ্লাগটি উড়বে। আমার ওপর প্রোগ্রামের দায়িত্ব। বিকেলের দিকে আমি ঠিক করলাম সাড়ে দশটায় অনুষ্ঠান শেষ করবো না। আমি তাড়াতাড়ি কন্ট্রোলরুমে গিয়ে জানালাম বাছাই করা গানগুলো চলতে থাকবে। সে সময় প্রায় ১০০ জনের উপরে পাকিস্তানি মিলিটারী ডিআইটি ভবনের মধ্যে ছিল। একজন মেজর ছিলেন। সাড়ে দশটা পেরিয়ে গেছে আমরা অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছি। মেজর সাহেব এলেন বললেন– 'ক্যায়া হো রাহা হে আব খতম নেহি হোতা হ্যা?' আমি বললাম 'আপকো মালুম নেহি হ্যা। আজ পাকিস্তান ডে হ্যা, স্পেশাল প্রোগ্রাম চলতে হবে।' ভেতরে তো ভয় ভয়। উপরে হেসে হেসে কথা বলছি। সকলকে চলে যেতে বললাম। কন্ট্রোলরুমে একজন বা দু'জন। পেছনে গাড়ি রাখলাম। আর এ্যানাউসার ফিরোজকে বললাম- অনুষ্ঠান সমাপ্ত ঘোষণা করেই পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে হবে। ১২টা ২ মিনিটে অ্যানাউসমেন্ট শুরু হলো। আজ ২৪ তারিখ। আজকে আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হলো। খোদা হাফেজ। ২৪ তারিখে ফ্ল্যাগ উড়েছে ২৩ তারিখে নয়। ২৫ শে মার্চ ক্র্যাকডাউন হলো। আমার বাসাটা ছিল পুলিশ লাইনের রাস্তার এদিকে শান্তিনগরে। ১১ টার দিকে দেখি পাকিস্তানি মিলিটারিরা দূর থেকে গুলি করতে করতে আসছে। সে কী শব্দ! আমরা ওখান থেকে সরে আলতাফ মাহমুদের বাড়ি চলে গেলাম। যাই হোক সারা রাত কাটলো। পরে বাসায় গিয়ে দেখেছি আমার ভক্সওয়াগন গাড়িটি বুলেটের ঝাঁঝরা হয়ে আছে। জামিল চৌধুরী সাহেব বললেন আপনার এখানে থাকা একদমই নিরাপদ নয়। আপনাকে খোঁজাখুজি করা হচ্ছে ২৩ শে মার্চের ব্যাপারে। বিখ্যাত ইকোনোমিষ্ট আনিসুর রহমান, ড. রেহমান সোবহান আর আমি এই

তিনজন যাবো কলকাতা। নিয়ে যাবে একটা ছোট্ট গ্রুপ। আমরা যাবো নারায়ণগঞ্জ পার হয়ে ব্রাহ্মনবাড়িয়া দিয়ে। ছোট্ট স্টিমার সেখানে আমরা উঠেছি তিনজন। তখন অল্প কয়েকজনের কাছে ছিল টেলিভিশন। তবুও আমার পাশে একটা ছোট্ট ছেলে বসা। বার বার তাকাচ্ছে। আমি তখন চুল কেটে ফেলেছি। একদম ছোট ছোট করে ফেলেছি। আমার তো সব সময় বড় বড় চুল ছিলো। তারপর আবার ফতুয়া-লুঙ্গী পরেছি।ছেলেটা বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছে। তারপর বলে– 'আপনাকে তো আমি টেলিভিশনে দেখেছি'। আমি তো ঘাবড়ে গেছি। ছোট ছেলে চিনে ফেলেছে।

স্টিমার যেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেমেছে তিন-চারজন এসে ধরেছে রেহমান সোবহান সাহেবকে। ওরা বলছে উনি 'বিহারি, পাকিস্তানি ওদের ছাড়বো না।' আমার এক ক্লাশ ফ্রেন্ড সে এবং আরও কয়েকটা ছেলে মিলে বাঁচালো। ওরা আরও লোকজন সাথে দিয়ে ব্রাহ্মনবাড়িয়া পাঠালো। সেইখান খালেদ মোশাররফ এলেন জিপে করে। আমাদের নিয়ে গেলেন বেতবুনিয়ায়। ওখানে গিয়ে দেখলাম একদল মিলিটারি বিদ্রোহ করেছে। খালেদ মোশাররফ তখন তাদের কমান্ডার। সেখানে টি গার্ডেনের একটি বাড়িতে দেখি গ্রামের লোকেরা সব হাঁড়ি হাঁড়ি করে খাবার আনছে। আমরা সেই খাবারই খেলাম। খালেদ মোশাররফ আমাদের তিনজনকে জিপে করে পাঠিয়ে দিলেন আগরতলায়। সেই আগরতলায় গিয়ে দেখি চট্টগ্রাম বেতারের দুই-তিনজন ওখানে এসেছে। সেখানে গ্যারেজের মতো একটা জায়গায় আমরা সবাই রেকর্ড করলাম। সেই রেকর্ডে আমিও ছিলাম। আমিও লিখলাম। ঘটনা কিছু লিখে পড়লাম। আরও কয়েকজন পড়লো। গ্যারেজের মধ্যে মাইক্রোফোন হাতে ধরে ও চেয়ারের মধ্যে যন্ত্রটি রেখে রেকর্ড করা হলো। সেগুলো আবার দু'একদিন পড়ে প্রচার করা হলো। সেখানে তাজউদ্দীন আহমদসহ অনেকের সাথে দেখা হলো। তিনি বললেন, 'আপনি মার্চ মাস জুড়ে টেলিভিশনে যে গানগুলো চালিয়েছেন সেগুলো নিয়ে আসেন'। অন্য কেউ গেলে তো পাবে না। আমি ভাবলাম এত কষ্টের পথ পেরিয়ে এলাম, আবার ফিরে যাব ঢাকায়! অবশেষে রেকর্ড কালেক্ট করতে ঢাকায় ফিরে এলাম। ওই রকম লুঙ্গী ও খুব পুরনো ধরনের একটা শার্ট পরা। নারায়ণগঞ্জে এসে ভোরবেলা মিলিটারি বাস আটকেছে। সকলকে নামিয়ে লাইন করে দাঁড় করালো। ড্রাইভারটা ভালোই উর্দু বলছিল। সে মিলিটারিকে বলল– 'স্যার এ লোক এধার সে অ্যায়া'। মিলিটারি আমার পকেটে একটু হাতটাত দিলো। তারপর বললো 'যাও আভি ভাগো'। আমরা আবার বাসে উঠে চলে গেলাম। বাস থেকে নেমে নদীর পাড় দিয়ে অনেক ঘুরে ঘুরে ঢাকায় ঢুকলাম। আমি কিছু রেকর্ড জোগাড় করে পরে আবার একই পথে আগরতলা ফিরলাম। ওখান থেকে কলকাতা। কলকাতায় গিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করার উদ্যোগ নেয়া হলো। শিল্পী, সাহিত্যিক, গায়ক অনেকেই কলকাতা চলে এসেছেন। আমরা জড়ো হতে থাকলাম। আমাদের লক্ষ্য ছিল– শুধু এক বেতার কেন্দ্র দিয়ে নয়, নানা মিডিয়ায়, নানাভাবে আমাদের কথা সবার কাছে প্রচার করতে হবে। এখানকার মানুষদেরকেও অনুপ্রাণিত করতে হবে। বলতে হবে বাংলাদেশের যুদ্ধের কথা। স্বাধীনতার কথা। চলমান...

*(৩০ নভেম্বর ২০২০, ধারণকৃত সাক্ষাৎকার)*

## অক্সফোর্ডের 'ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব রিফিউজি ল'-এ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্মীর গবেষণা প্রবন্ধ

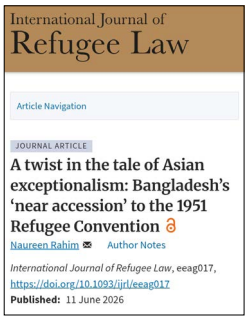
International Journal of
Refugee Law

Article Navigation

JOURNAL ARTICLE

A twist in the tale of Asian exceptionalism: Bangladesh's 'near accession' to the 1951 Refugee Convention

Naureen Rahim ✉ Author Notes

*International Journal of Refugee Law*, eeag017, https://doi.org/10.1093/ijrl/eeag017

**Published:** 11 June 2026

সেন্টার ফর দ্যা স্ট্যাডি অফ জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের কর্মী এবং নরওয়ের ইউনিভার্সিটি অফ অসলো-এর পিএইচডি গবেষক নওরীন রহিমের গবেষণা প্রবন্ধ A twist in the tale of Asian exceptionalism : Bangladesh's `near accession' to the 1951 Refugee Convention অক্সফোর্ডের 'ইন্টারন্যাশনাল জার্ণাল অব রিফিউজি ল'-এ প্রকাশিত হয়েছে

নওরীন তার গবেষণায় এশীয় ব্যতিক্রমবাদ (Asian exceptionalism)-এর দাবিকে খন্ডন করেছে বাংলাদেশকে একটি অনন্য উদাহরণ হিসেবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তিনি দেখিয়েছেন বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রধান শরণার্থী আশ্রয়দানকারী রাষ্ট্র, যা ১৯৮৯ সালে শরণার্থীদের মর্যাদা সম্পর্কিত ১৯৫১ সালের কনভেনশনে (১৯৫১ Convention Relating to the Status of Refugees) যোগদানের খুব কাছাকাছি পৌঁছেছিল।

প্রবন্ধটি সেই সময়কালকে সমাজ-আইনি (socio-legal) ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছে, যখন বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে কনভেনশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এই ঘটনাটিকে 'প্রায়-অধিগ্রহণ' (near accession) হিসেবে বিবেচনা করে প্রবন্ধটি এই উপসংহারে পৌঁছেছে যে, ১৯৫১ সালের কনভেনশনকে এশীয় দেশগুলোর প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাটি সার্বজনীন প্রযোজ্য নয়; বরং এই অঞ্চলের কিছু রাষ্ট্র কনভেনশনটির প্রতি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের অবস্থান বিবেচনা করেছিল।

গবেষক বাংলাদেশকে একটি কেস স্টাডি হিসেবে গ্রহণ করে ১৯৫১ সালের কনভেনশনে 'প্রায়-অধিভুক্তি' (near accession)-এর সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার তিনটি আন্তসংযুক্ত উপাদান চিহ্নিত করে বলেন, জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার (UNHCR)-এর সমন্বিত উদ্যোগ অধিভুক্তিকে উৎসাহিত করেছিল, তার প্রত্যাশা ছিল বাংলাদেশের সদস্যপদ আঞ্চলিক পর্যায়ে একটি প্রভাবশালী দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, পাশাপাশি সরকার এবং UNHCR উভয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা এই অধিভুক্তি প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন। গবেষক এটিও বিশ্লেষণ করেছেন যে, ১৯৫১ সালের কনভেনশনে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক অধিভুক্তি সম্পন্ন করেনি। আজও বাংলাদেশ এই কনভেনশনের অ-স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসেবে রয়ে গেছে। বাংলাদেশের 'প্রায়-অধিভুক্তি' (near accession)-এর এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক গবেষণা ১৯৫১ সালের কনভেনশনকে ঘিরে দক্ষিণ এশিয়ায় বিদ্যমান একরৈখিকতার ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং এর মাধ্যমে অ-স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়ায় নতুন ধারনা তৈরি করে; একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক শরণার্থী আইন অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে।

**প্রবন্ধটি পড়তে নিচের লিংকে ক্লিক করুন**

https://academic.oup.com/ijrl/advance-article/doi/10.1093/ijrl/eeag017/8706458

# মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে পাকিস্তানে প্রথম বাঙালি মেজর জেনারেল মুহাম্মদ ইশফাকুল মজিদ-এর পুত্র ও পৌত্র

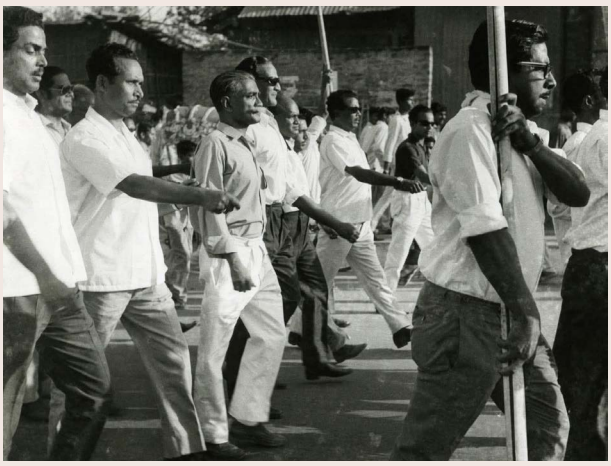

*১৯৭১ সালের ২২ মার্চ অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে বায়তুল মোকাররম এলাকা থেকে অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাদের মিছিল। মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানী এবং ইশফাকুল মজিদ (মাঝে সানগ্লাস পরিহিত)*

১৯ জুন ২০২৬ আগারগাঁওস্থ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঘুরে দেখেন পাকিস্তানের প্রথম বাঙালি মেজর জেনারেল মুহাম্মদ ইশফাকুল মজিদ-এর পুত্র মো. ফয়সাল ও পৌত্র শাফকাত লতিফ ফিয়াজ। তারা জাদুঘরের গ্যালারিগুলো ঘুরে দেখেন। বিশেষ করে ২ নম্বর গ্যালারির অসহযোগ আন্দোলন অংশে প্রদর্শিত মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এমএজি ওসমানীসহ অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের আন্দোলনরত ছবিটিতে বাবা ও দাদুর ছবি দেখে আবেগাপ্লুত হন।

গ্যালারি পরিদর্শন শেষে জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্যসচিব মফিদুল হক-এর সাথে আলাপ করেন। মফিদুল হক বলেন, 'মুহাম্মদ ইশফাকুল মজিদ ইতিহাসের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছেন কিন্তু তিনি সেভাবে উঠে আসেননি। আমরা চাই নতুন প্রজন্ম উনাকে জানুক উনার ইতিহাসকে ধারণ করুক।' তিনি মজিদ সম্পর্কিত স্মারকসমূহ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে দেওয়ার জন্য পরিবারের প্রতি আহ্বান জানান। আলাপকালে ফয়সাল জানান, তার বাবার বহু স্মারক ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে হারিয়ে গেলেও এখনও কিছু নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তার বাবার ব্যবহৃত ইউনিফর্ম, অভিধান, কলম, প্লেট, আলোকচিত্র ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা চিঠি। এইসব স্মারক জাদুঘরে হস্তান্তরের বিষয়ে পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে বলে তিনি উল্লেখ্য করেন।

মুহাম্মদ ইশফাকুল মজিদ ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রথম বাঙালি মেজর জেনারেল এবং উপমহাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট সামরিক কর্মকর্তা। ব্রিটেনের স্যান্ডহার্স্টে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রথম বাঙালি মুসলিম ক্যাডেট হিসেবে তিনি ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মজীবন শুরু করেন। দেশভাগের পর তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং জ্যেষ্ঠতম দেশীয় কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তবে বাঙালি পরিচয়ের কারণে বারবার বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হন। তৎকালীন সামরিক সচিব ইস্কান্দার মির্জা এবং প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের কারসাজিতে তার চেয়ে দুই বছরের জুনিয়র আইয়ুব খানকে সেনাপ্রধান করা হয়।

১৯৫১ সালে ঐতিহাসিক 'রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র' মামলায় সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও আইয়ুব খানের চক্রান্তে তাঁকে মিথ্যাভাবে জড়ানো হয়। তদন্তে তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হলেও, এই গভীর অন্যায় ও বঞ্চনার ক্ষোভ ও দুঃখে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে করাচি ছেড়ে তিনি স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসেন। বুড়িগঙ্গার তীরে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বসবাস শুরু করেন।

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের সংগঠিত করেন। ২২ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও কর্নেল এমএজি ওসমানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আনুগত্যের প্রতীক হিসেবে একটি তরবারি উপহার দেন। ২৫ মার্চের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বঙ্গবন্ধু ও ওসমানীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ ও নির্যাতন চালায়। কিন্তু তিনি সকল নির্যাতন উপেক্ষা করে

*মেজর জেনারেল মুহাম্মদ ইশফাকুল মজিদ-এর পুত্র মো. ফয়সাল ও পৌত্র শাফকাত লতিফ ফিয়াজ*

পাকিস্তানি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৭১ সালের আগস্টে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু তাকে উচ্চ পদে দায়িত্ব পালনের প্রস্তাব দিলেও শারীরিক অসুস্থতা ও বয়সের কারণে তা গ্রহণ করেননি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্যাতনের প্রভাবে অসুস্থ হয়ে ১৯৭৬ সালের ৩১ মার্চ ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঢাকার আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়।

**-মন্টু বাবু সরকার,** মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

# শুরু হচ্ছে গণহত্যা ও ন্যায়বিচার শীর্ষক ১৫তম সার্টিফেকেট কোর্স

Applications are now open for the 15th Certificate Course on Genocide and Justice commencing on 7 August 2026!

Are you interested in understanding genocide, mass atrocities, memory, justice, and humanitarian crises? Join a month-long learning experience featuring interactive sessions by renowned academics, practitioners, and social activists on key issues related to genocide and justice, along with a field visit to one of the memorial sites of genocide. In-person Weekend Classes (Friday & Saturday)

Application Deadline: 8 July 2026

**Application Form:**
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecXMAaAQIwvp2WCUZDMFJH_LMf-_EBuJOazbVgHSdMaEmipA/viewform

# একাত্তরের স্মৃতিচারণ : শহীদ আক্রব আলী

২১ মে জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় সাপ্তাহিক স্মৃতিচারণমূলক কর্মসূচি। মিরপুর ইন্টারন্যশনাল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ৩০ জন শিক্ষার্থী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শনের পর শুরু হয় স্মৃতিচারণ। শহীদ আক্রব আলীর সন্তান মো. ফরিদুজ্জামান শিক্ষার্থীদের সাথে তার বাবার নির্মম হত্যার স্মৃতিচারণ করেন। সেই কষ্টের স্মৃতিগুলো তিনি ভাগ করে নেন নতুন প্রজন্মের সাথে। তিনি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের মধ্যে তার বাবাও আছেন। মুক্তিযুদ্ধকালে আক্রব আলী সপরিবারে মিরপুর ১১ নম্বরে নিজ বাড়িতে বাস করছিলেন। মিরপুরের পরিস্থিতি খারাপ থাকায় ২৭ মার্চ রাতে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য তিনি পরিবারের সকলকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পাঠিয়ে দেন। কিন্তু আক্রব আলী ও তাঁর ভাইয়েরা নিজ বাড়িতে থেকে যান। ২৮ মার্চ সকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী তাদের বাড়ি ঘিরে ফেলে এবং ছয় ভাইকে আটক করে। সবাইকে চোখ বেঁধে লাইন করে দাঁড় করায় গুলি করার জন্য। সে সময় প্রতিবেশী পাকিস্তানি রহমান সাহেব পাকবাহিনীর সাথে কথা বলে তাদেরকে উদ্ধার করেন। সে যাত্রায় তারা সকলেই বেঁচে যান। রহমান সাহেব সবাইকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। আক্রব আলী চলে যান তার পরিবারের কাছে। যুদ্ধকালে আক্রব আলী পরিবারের সকলকে নিয়ে বিভিন্ন যায়গায় নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ঘুরে বেড়িয়েছেন। এর মধ্যে আক্রব আলীর ছোট সন্তানের জন্ম হয়। শিশু পুত্রসহ আক্রব আলী মহাখালি ওয়্যারলেস গেট চলে আসেন। দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত তিনি সপরিবারে সেখানেই ছিলেন। সে সময় আক্রব আলী 'ডান্ডি' কার্ড যোগাড় করে জীবিকা নির্বাহের জন্য রাস্তায় বসে তরিতরকারি বিক্রি করতেন। ১৬ ডিসেম্বর আক্রব আলী বাড়ি ফিরে বড় সন্তান মো. ফরিদুজ্জামানকে জড়িয়ে ধরে বলেন, বাবা দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে এবার আমরা নিজেদের বাড়ি ফিরে যাব। ১৮ ডিসেম্বর আক্রব আলী সপরিবারে মিরপুরে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। বাড়িতে তিনি কিছু অস্ত্র পান এবং বুঝতে পারেন পাকবাহিনী তাদের বাড়ি ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করেছে। আক্রব আলী অস্ত্রগুলো (৪টা রাইফেল, কিছু গোলাবারুদ) ভারতীয় বাহিনীর হাতে তুলে দেন। এছাড়া আক্রব আলীর দুই ভাই আশ্রাফ আলী ও মোহাব্বত আলী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। এই সকল কারণে আক্রব আলী বিহারিদের ক্রোধের শিকার হন। এর মধ্যে কোরবানীর

ঈদ চলে আসে। ঈদের দিন আক্রব আলী ব্যবসার কাজে মহাখালিতে যান। দেশ স্বাধীন হওয়ায় লোকজন মিরপুর এলাকায় নিজ নিজ বাড়িতে ফিরতে শুরু করে। ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি বিহারিরা মিরপুর এলাকায় উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই খবর পেয়ে আক্রব আলী মহাখালি থেকে মিরপুরে আসেন। পরিবারের সকলকে তিনি মহাখালিতে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। মিরপুর ১৩ নম্বর পর্যন্ত যাওয়ার পরেই গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। ভয় পেয়ে তিনি আলী হোসেন সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেখানে গিয়ে দেখেন আরও অনেকেই সে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। বেশির ভাগই ছিল মহিলা। শোনা যাচ্ছিল শুধু পুরুষদেরকে মারা হবে, মহিলাদেরকে নয়। তখন সকলে মিলে আক্রব আলীকে ঘিরে দাঁড়াল যেন আক্রব আলীকে দেখা না যায়। কিন্তু গুলির আওয়াজে তার ভাইয়ের স্ত্রী সরে দাঁড়ালে বিহারিরা আক্রব আলীকে দেখে ফেলে এবং বলে 'উসকো নিকালো'। সবাই তখন বিহারিদের অনুরোধ করে আক্রব আলীকে না মারার জন্য। আক্রব আলীর বড় সন্তান দশ বছরের ফরিদুজ্জামানও বিহারিদের পা জড়িয়ে ধরে অনুরোধ করে তার বাবাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু তারা শিশু ফরিদুজ্জামানকে লাথি মেরে ছিটকে ফেলে দেয়। সকলের সামনেই তারা আক্রব আলীর পেটের মধ্যে দুটি গুলি করে। আক্রব আলীর স্ত্রীর হাতেও গুলি লাগে। কোন রকমে প্রাণ নিয়ে সেখান থেকে সবাই ভাষানটেক চলে যান। পরদিন আক্রব আলীর ভাই মুক্তিযোদ্ধা আশ্রাফ আলী ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফোর্স নিয়ে আক্রব আলীর লাশ উদ্ধার করে ভাসানটেক পারিবারিক কবরস্থানে কবর দেন। শিক্ষার্থীদের কাছে মো. ফরিদুজ্জামানের একটাই প্রত্যাশা, তারা যেন মুক্তিযুদ্ধের সত্য ইতিহাস জানে এবং স্মরণে রেখে দেশের কল্যাণে কাজ করে। স্মৃতিচারণ শেষে সাদিকা নামে এক শিক্ষার্থী মন্তব্য লেখে, 'আমার এই জল্লাদখানায় এসে খুব কষ্ট লেগেছে।' সহকারী প্রধান শিক্ষিকা তাসলিমা খাতুন লেখেন, 'মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। জল্লাদখানার কর্তপক্ষকে অনেক ধন্যবাদ নতুন প্রজন্মের সামনে মুক্তিযুদ্ধের সত্য ইতিহাস তুলে ধরার জন্য।'

**– প্রমিলা বিশ্বাস**
জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

## মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)-এর শিক্ষার্থী দল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদন এবং ঐতিহাসিক নিদর্শনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহ, ১৯৭১ সালের গণহত্যা, প্রতিরোধ আন্দোলন এবং বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয়ের ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হন। গ্যালারি পরিদর্শন শেষে 'বাংলাদেশ গণহত্যা ও বৈশ্বিক রাজনীতি: স্মৃতি, অস্বীকৃতি এবং শিক্ষা' শিরোনামের আলোচনায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব এবং সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের পরিচালক মফিদুল হক শিক্ষার্থীদের সাথে যুক্ত হন। আলোচনায় গণহত্যা গবেষণা, আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার এবং ১৯৭১ সালের গণহত্যার স্বীকৃতির জন্য চলমান সংগ্রামের বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরা হয়।

গণহত্যা শব্দটির উৎপত্তি দিয়ে শুরু করে মফিদুল হক আলোচনা করেন কিভাবে সময়ের সাথে গণহত্যা প্রতিরোধে বৈশ্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে – বিশেষত ১৯৯০-এর দশকে সাবেক যুগোস্লাভিয়া ও রুয়ান্ডার জন্য আন্তর্জাতিক ফৌজদারি ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা এবং ২০০২ সালে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত গঠনের পর থেকে।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশ গণহত্যা এবং তাকে ঘিরে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তিনি ব্যখ্যা করেন কিভাবে স্নায়ুযুদ্ধকালীন ভূরাজনৈতিক স্বার্থ বাংলাদেশে সংঘটিত নৃশংসতার প্রতি আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি বলেন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বেসামরিক নাগরিক ও শরণার্থীদের দুর্দশা ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হলেও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মঞ্চে গণহত্যার বিষয়টি সীমিত মনোযোগ পেয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের জন্য ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের আহ্বান এবং ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন প্রণয়নসহ বিভিন্ন উদ্যোগ তিনি আলোচনা করেন।

ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আসলে ভুলে যাওয়ার বিরুদ্ধে স্মৃতির সংগ্রাম – এই পর্যবেক্ষণটি উল্লেখ করে মফিদুল হক ঐতিহাসিক সত্য সংরক্ষণের গুরুত্বের উপর জোর দেন। তিনি আলোচনা করেন কিভাবে জাদুঘর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গবেষকবৃন্দ, বেঁচে থাকা মানুষ এবং সাধারণ নাগরিকরা মিলে ইতিহাস বিকৃতি বা মুছে ফেলার চেষ্টার বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভূমিকাও তুলে ধরা হয়। ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে জাদুঘরটি শুধু ঐতিহাসিক নিদর্শন সংরক্ষণেই নয়, শিক্ষামূলক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, গবেষণা উদ্যোগ, ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী, আন্তর্জাতিক সম্মেলনসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মধ্যে গণহত্যা, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে চলেছে। আলোচনার সমাপনীতে তিনি বলেন যে স্মৃতি সংরক্ষণই পারে অস্বীকৃতি, বিকৃতি এবং সামষ্টিক বিস্মৃতির বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে। তিনি শিক্ষার্থীদের ঐতিহাসিক বিবরণী সংরক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে এবং সেগুলোকে আরও ন্যায়সংগত, শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে ব্যবহারে উৎসাহিত করেন।

প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে আলোচনার সমাপ্তি ঘটে, যেখানে শিক্ষার্থীরা পরিদর্শন ও আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন।

**ফারিয়া আক্তার**
ইন্টার্ন, সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস
ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ

# আন্তর্জাতিক শরণার্থী দিবসে UNHCR-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ এইচ. ই. মি. আইভো ফ্রেইজসেন-এর ভাষণ : ২৪ জুন ২০২৬

For World Refugee Day, I traveled to the Rohingya refugee camps in Cox's Bazar, where we marked the occasion with an incredible football tournament between Rohingya refugees, and humanitarian and government colleagues. In a thrilling final match on Sunday, the Rohingya footballers took the trophy, with a 2-0 victory.

Too often, refugees are seen only through the lens of crisis — through politics, security concerns, images of suffering, and stories that emphasize difference rather than solidarity. On that football field, we saw young people with hopes, dreams, and talent — like young footballers and fans anywhere in the world.

Against the backdrop of the World Cup, the image was especially powerful. It reminded us that aspiration, ability, and joy are universal.

Today, we remember the strength and courage of the 10 million Bangladeshi men and women who sought shelter across the border in India during the devastating 1971 Liberation War. Though they carried few material possessions, each of them carried hopes for the future.

And, eventually, this brave nation emerged from the hopes, dreams, courage and sacrifices of individual Bangladeshis.

This history lives in this country's recent memory – especially in the way that Bangladeshis have opened their doors and hearts to the Rohingya community.

But, today, World Refugee Day takes place against a backdrop of uncertainty, mounting pressure on asylum systems, shrinking humanitarian aid, and record levels of forced displacement. There are more conflicts, and they last longer.

70% of the world's refugees live in protracted displacement — in exile for five years or more, with no clear path home. That is nearly 25 million people.

Total refugee numbers fell slightly in 2025 — the first decline in a decade. But, if we look closely at the returns, more than 90% went back to just three countries: Afghanistan, Syria, and Sudan — places still marked by insecurity and destroyed infrastructure.

Resettlement collapsed: fewer than 82,000 people were resettled globally last year, down from 189,000 in 2024. The gap between need and response has never been wider.

Being a refugee should never be a permanent condition. Humanitarian assistance should never be more than a temporary lifeline. When refugees are left for years in a state of dependency — without the chance to actively create their own lives — the global system has failed.

The 1.2 million Rohingya here in Bangladesh deserve better. Not just refugees, they are members of the world's largest stateless population — 41% of all stateless people on earth are Rohingya.

It's not a choice to be stateless. And it's not a choice to be a refugee. The Rohingya tell us every day that they want to return — when it is safe— just as Bangladeshis did in 1971.

But the conditions in Myanmar are not right for people to return in a safe, dignified, voluntary — and durable — manner. The root causes of their displacement persist. Fighting continues in Rakhine State. They still lack rights. As of today, no party in Myanmar has a plan to address their statelessness.

In the spirit of shared humanity, can we ask people to return under such risky conditions?

Meanwhile, the Joint Response Plan for the Rohingya humanitarian crisis is underfunded. This means less assistance, disrupted education, weakened health services, and growing protection risks — especially for women and girls.

Less funding means difficult choices that affect people's long-term health, safety and dignity – with serious consequences for the future.

Three things are required.

First, donors must stay the course to prevent deteriorating humanitarian conditions. Bangladesh has done more than its share to support the refugees. The international community must match that with sustained, predictable funding.

Second, it is critical to invest in self-reliance — livelihoods, skills, education — so that dependency gives way to opportunity. Donors continue to show generosity – but we cannot expect humanitarian funding to return to previous levels.

The only way to keep the situation manageable is to ensure that refugees have a little bit more of their own income.

Third, solutions in Myanmar must stay at the forefront. We need to find a way home for the Rohingya. If the international community believes this crisis has gone on too long, it must invest in solutions. Particularly conditions that that make safe, voluntary, and durable return possible.

In 1971, Bangladeshis' displacement lasted months, not decades. A happy ending may be late for the Rohingya – but not too late. They are counting on us.

## জাদুঘর প্রকাশনার পুনর্মুদ্রণ

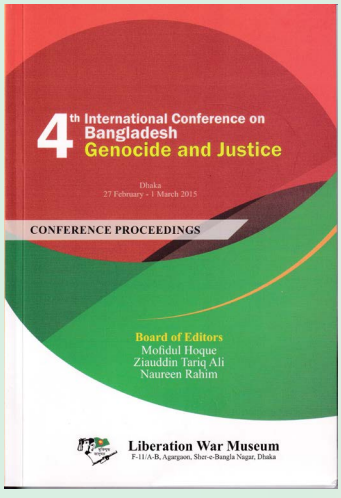


মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বহুল প্রচলিত প্রকাশনা 4th International Conference on Genocide and Justice এর Conference Proceedings টি দ্বিতীয় বারের মত পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। গণহত্যা প্রতিরোধে স্মৃতি, ন্যায়বিচার, গণমাধ্যম, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা, শিল্প ও গবেষণার অবদান, এবং ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচারের দাবিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা এটিতে সংকলিত হয়েছে। ২০২২ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

**মূল্য : ৬০০ টাকা**

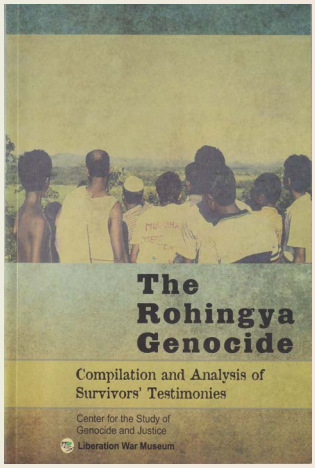


মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গবেষণাধর্মী প্রকাশনা The Rohingya Genocide: Compilation and Analysis of Survivors' Testimonies তৃতীয় বারের মত পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ২০১৮ সালে এই গবেষণাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে রোহিঙ্গা গণহত্যা, জোরপূর্বক স্থানচ্যুতি এবং সহিংসতা থেকে জীবিত বেঁচে ফেরা মানুষের সাক্ষ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংকটটির মানবিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে।

**মূল্য : ৫০০ টাকা**

বইদুটি সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন–
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০২৬

## মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষ অতিথি

Millennium Campus Network এর পক্ষ থেকে Dr.Sue Maxam, Co-Chair Civic Learning Council, Pace University এবং Simran Kaur, University Realtion Manager, ১৯ জুন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

BRAC University আয়োজিত GHEA21 Gen Engaged Conference 2026 : Student Action and youth leadership কনফারেন্সে আগত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি ও মেন্টররা গত ১৩ জুন ২০২৬ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

### সিএসজিজের ১৯তম মাসিক বক্তৃতা

# ঘৃণামূলক বক্তব্য থেকে গণহত্যা : রোহিঙ্গা গণহত্যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা

সেন্টার ফর স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস-এর নিয়মিত মাসিক বক্তৃতা সিরিজের ১৯তম পর্ব গত ২৯ জুন ২০২৬ তারিখ বিকেলে মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। 'ঘৃণামূলক বক্তব্য থেকে গণহত্যা: সামাজিক মাধ্যমের বিস্তার এবং রোহিঙ্গা গণহত্যা' শীর্ষক বিশেষ বক্তৃতায় মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাবাসসুম ইসলাম তামান্না, যিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বিংহ্যামটন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার অব সাইন্স ইন জেনোসাইড এন্ড ম্যাস এট্রসিটি প্রিভেনশন প্রোগ্রামের গ্র্যাজুয়েট টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট। তিনি সিএসজিজের সাবেক স্বেচ্ছাসেবক ও গবেষণা সহকারী হিসেবেও বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প, বিশেষত রোহিঙ্গা শরণার্থী বিষয়ক গবেষণায় কাজ করেছেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সেন্টার ফর স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস-এর পরিচালক মফিদুল হক। তিনি বক্তার সঙ্গে সিএসজিজের দীর্ঘদিনের সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করে বলেন, তামান্না সিএসজিজের বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, বিশেষ করে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে পরিচালিত গবেষণায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি মাসিক বক্তৃতা সিরিজের গুরুত্ব তুলে ধরে জেনোসাইড, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারবিষয়ক সমসাময়িক আলোচনার জন্য এ ধরনের আয়োজনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মূল বক্তৃতায় তাবাসসুম ইসলাম তামান্না অনলাইন ঘৃণামূলক বক্তব্য কীভাবে বাস্তব জগতে ঘৃণাজনিত অপরাধ এবং পরবর্তীতে গণহত্যার অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে, তা রোহিঙ্গা গণহত্যার প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেন। তিনি তুলে ধরেন যে, মিয়ানমারে দীর্ঘদিন ধরে ফেসবুকই ছিল সাধারণ মানুষের তথ্যপ্রাপ্তির প্রধান মাধ্যম। কার্যকর ফ্যাক্ট-চেকিং ব্যবস্থা, স্থানীয় ভাষাভিত্তিক কনটেন্ট মডারেশন এবং পর্যাপ্ত নজরদারির অভাবের সুযোগে ইসলামবিদ্বেষী প্রচারণা, রোহিঙ্গাদের 'বাঙালি' হিসেবে আখ্যায়িত করে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য দ্রুত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। বক্তার মতে, ফেসবুকের অ্যালগরিদম এসব কনটেন্টের প্রসারকে আরও ত্বরান্বিত করে, যা সমাজে বিদ্বেষ, বিভাজন ও সহিংসতার পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বক্তৃতায় Jane Doe v. Meta মামলাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেস স্টাডি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বক্তব্যের বিস্তারে মেটার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিকেশন ডিসেন্সি এ্যাক্ট, ১৯৩৪ এর ধারা ২৩০ এর আইনি সুরক্ষার কারণে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে জবাবদিহি নিশ্চিত করা এখনো জটিল রয়ে গেছে। পাশাপাশি তিনি চলমান আইনি প্রক্রিয়া, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং গণহত্যায় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য দায় নিয়ে চলমান বিতর্ক তুলে ধরেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ঘৃণামূলক বক্তব্য ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে কেবল প্ল্যাটফর্ম নয়, বরং নীরব দর্শক, নীতিনির্ধারক এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর নিষ্ক্রিয়তাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারীরা অনলাইন ঘৃণামূলক বক্তব্য, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দায়বদ্ধতা এবং দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে এর প্রভাব নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। মেহজাবিন নাজরানার এক প্রশ্নের উত্তরে বক্তা বাংলাদেশে অনলাইন ঘৃণামূলক বক্তব্য প্রতিরোধে শিক্ষা, ডিজিটাল সাক্ষরতা, সমালোচনামূলক চিন্তার বিকাশ এবং দায়িত্বশীল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের সংস্কৃতি গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সমগ্র বক্তৃতায় রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিজ্ঞতার আলোকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভূমিকা, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি এবং ঘৃণামূলক বক্তব্য প্রতিরোধে ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও প্রযুক্তি কোম্পানির সম্মিলিত দায়িত্বের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উঠে আসে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অগ্নিজিতা দে সেঁজুতি।

**মোহাম্মদ তালহা**
রিসার্চ ইন্টার্ন, সিএসজিজে
এলএলবি, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে মফিদুল হক, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম, গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩,
ইমেইল: mukti.jadughar@gmail.com, ওয়েব: www.liberationwarmuseumbd.org, ফেসবুক: facebook.com/liberationwarmuseum.official